বাস্তব পরাবাস্তব বীক্ষণে আর্থ সামাজিক চিত্র

হীরক বিশ্বাস

(দশম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের পর্যালোচনা)

দশম কলকাতা উৎসবের ময়না তদন্তে যাবার আগে কয়েকটা কথা বলতেই হয়। বিশ্বায়নের যূপকাষ্ঠে পড়ে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্প তার নিজের স্বতন্ত্রতা অনেকটা হারিয়েছে। হলিউডের আগ্রাসনে ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশের চলচ্চিত্রে সৃজনীর অভাব প্রকট। আশির দশকের প্রথমদিকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে বছরে দেড়শোর মত ছবি তৈরী হতো। এখন হলিউডি ছবির রমরমায় সেই দেশগুলিতে দশটি ছবিও তৈরী হয় না। ওই সব দেশে ছবিঘরগুলিতেরাতদিন চলে হলিউডের ছবি। শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশকরা সব কটি হল দখল করে নিয়েছে নিজেদের দেশেরছবির প্রদর্শনীর জন্য। ভেনেজুয়েলায় কোনো পরিবেশক প্রয়োজক নেই। পরিচালককে নিজেই প্রয়োজন পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে হয়। আমেরিকান পরিবেশকরা তাদের স্বার্থে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যাতে তারা পরসম্পরের ছবি না দেখায়। ফলে ব্রাজিলের ছবি ভেনেজুয়েলা বা চিলির ছবি নিকরাগুয়া দেখতে পায় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এ সব দেশে ছবির বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। এসব কথা উৎসবে আসা পরিচালকদের কণ্ঠনিসৃত।

এসব প্রতিকূলতার মধ্যেও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে বা অন্য দেশের ছবি আমাদের আলোড়িত করেছে সৃজনী শিল্পের পরিচয় বহন করে। এবারের উৎসবের সূচনাকারী ছবি ছিল চিলির 'সাব টেরা' (ভূতল)। ঊনবিংশ শতাব্দীর খনি শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৈরী। 'কয়লা খনির মালিক লুই তার ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিল ডেভিস নামে এক বিদেশীকে। কিন্তু অমানবিক ডেভিস শ্রমিকদের কাছে নরখাদক হয়ে উঠেছিল। খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ তার পরিচালনার অঙ্গ। স্বভাবতই শ্রমিকদের অসন্তোষএকসময় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের সময়ে বিদেশে পড়াশোনা করা মালিকের মেয়ে ভার্জিনীয়া দেশে ফিরে এসে ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করে তার পুরাতন প্রেমিক ফার্নান্দোকে, যে আজ তার বাবারই খনির এক শ্রমিক। পুরানো প্রেম আবার দুজনকে একত্রিত করে এক দ্বান্দ্বিক সময়ের পরিবেশ। প্রেম প্রতিবাদের এ ছবি দৃশ্য ও আলোর মুন্সিয়ানায় এক সুররিয়ালিস্টিক মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। খনিধবস, মৃত্যু, বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে এ ছবি আবেগপূর্ণ পাবলোর মধুর মূর্চ্ছনায় ধ্বংসের মধ্যে চিরন্তন প্রেমের অবিসংবাদী জয়গান। পুত্র পাবলোর মৃত্যুতে শোকার্ত মার খনিগহ্বরে ঝাঁপের পাশাপাশি দুই প্রেমিক - প্রেমিকার অদৃশ্য প্রাচীর ঠেলে মিলনের আর্তি দর্শকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। অত্যন্ত আশার কথা যে পরিচালক মার্সালো ফেয়ারী হলিউডি স্রোতে গা না ভাসিয়ে যে রোমান্টিক বাস্তবতার ছবি উপহার দিলেন তাতে আমরা সে দেশের চলচ্চিত্র ভবিষ্যতের প্রতি আশান্বিত। চিলির আর একটা ছবি "বি হ্যাপি' -এর ক্যাথি নামে এক কিশোরীর জীবনের টানাপোড়েনের কাহিনী। চিলির প্রত্যন্ত শহরে মা - দাদার সঙ্গে সে বসবাস করে। বাবা নানা অসামাজিক কাজকর্মের জন্য বারবার জেলে অন্তরীণ তাকে। মা এক দোকানে কাজ করে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দোকানের মালিক তার শরীর উপভোগ করে। বিনিময়ে চাকরীর স্থায়িত্ব ও নানা উপহার। এভাবেই চলে জীবন - সংগ্রাম। এদিকে ক্যাথিও স্কুলে পড়ারসময় থেকেই জীবনের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে শেখে। এই সময়ে তার প্রেম হয় এক স্কুল সহপাঠীর সঙ্গে এবং যৌন জীবনের আস্বাদও গ্রহণ করে। দাদার নানা

গোপন জীবনের পরিচয় জানতে পারে। আত্ম - আবিষ্কারে সে উপলব্ধি করে এ পৃথিবীতে কোনো কিছুতে ভয় না পেয়ে তঁাকে বেঁচে থাকতে হবে। বাবার বারবার জেল-যাপনে মা ভগ্নহৃদয়ে শেষপর্যন্ত ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সহকামী দাদা চলে যায় নিজের পথে। একা ক্যাথি একসময়ে জেল পালানো আহত বাবার খোঁজ পায় এক হাসপাতালে। বাবাকে বাঁচাতে শরীর বেচে টাকার জোগাড় যখন হলো, বাবা তখন লোকান্তরিত। বাবার কাছে থেকে শোনা তাদের পূর্বপুষের ভিটে অ্যারিকাশহরের কথা। শিকড়ের খোঁজে ক্যাথির স্বপ্নযাত্রা শু হয় সেই শহরের অভিমুখে। কয়েকটা অসাধারণ চরিত্রের সমন্বয়ে পরিচালকজাস্টিনিয়ানো চিলির অস্থির সমাজজীবনের ছবি সুকৌশলে তুলে ধরেছেন। ছোট ছোট দৃশ্যে কাট, স্টার্ট - কাট -- জীবন এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব ভঙ্গিমায়। ক্লোজআপে ক্যাথির স্থির চোখ আমাদের বুকের গভীরে বেদনার অভিঘাত সৃষ্টি করে। ক্যাথি চেয়েছিল সুখ পেতে,সুখ দিতে; কিন্তু জীবন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুষ সমাজের নিষ্ঠুর অভিঘাতে, স্বপ্ন হয়েছে লুণ্ঠিত। কানাডার ছবি 'দ্য রেড ভায়োলিন' দেখে মন আবেশে জুড়িয়ে যায়। এ ছবিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়? মিউজিক্যাল, থ্রিলার না ইন্টেলেকচুয়াল থ্রিলার? তর্কেরঅবকাশ রেখে বলি মন ভালো করে দেওয়া এ ছবির কাহিনী তৈরী হয়েছে বেহালার সংগীতের সুরে। তিনটি মহাদেশে ছড়ানো এ কাহিনী।সংলাপের ভাষাও পাঁচটি। বিভিন্ন সময়ের বেহালা বাদনের প্রচলনকে মনে রেখে মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতে সৃষ্টি এ ছবি। ইতালির ক্রেমোনোর নগরীর বিখ্যাত বেহালা নির্মাতা নিকোলো বুসোত্তির তৈরী করা সে যুগের কিংবদন্তী লাল বেহালা। বুসোত্তি এটি তৈরী করেন ১৬৮১ সালে, আর তারপর থেকে এটি তিনশো বছর ধরে দেশে - দেশে, হাতে - হাতে ঘুরে শেষে মন্ট্রিয়েলে (কানাডা) এসে নিলামে চড়েছে। সেই নিলামে দরাদরির ফাঁকে ফ্ল্যাশ ব্যাকে লাল বেহালার ইতিবৃত্ত আমরা জানছি। এর লাল রঙের ইতিহাস খোঁজা হচ্ছে। নিউইয়র্কের বিশেষজ্ঞ সমজদার চার্লস মরিৎজ -এর হদিশ খুঁজতে এসেছেন। ধীরে ধীরে পর্দায় এর রহস্য উন্মোচন নিয়ে পরিচালক ফ্রঁসোয়া জিরর দুঘন্টার উপর একটু একটু করে বিভিন্ন সুরে এর কাহিনী শুনিয়েছেন। এ বেহালাটি অভিশপ্ত। এ বেহালা হাতে নিয়ে সুর তুলতে গিয়ে মারা যায় বিস্ময় বালক কাসপার ভাইস। সে ভিয়েনায় গিয়েছিল রাজসভার বাজানোর পরীক্ষা দিতে। শতাব্দীকাল পরে অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বেহালা বাদক ফ্রেডারিক পোপ ও তাঁর বান্ধবীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ ছিলো এই বেহালা। আরও অনেক পরে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে কমিউনিস্ট সদস্য সিয়াংপেই একদিকে এই বেহালার দুর্ণিবার আকর্ষণে আর অন্যদিকে মাওয়ের আদর্শের প্রতিআনুগত্যের টানাপোড়েনে যন্ত্রণাগ্রস্ত, বিপর্যস্ত। শেষে ইতিহাসের অন্ধকারে আবৃত এ বেহালার সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন হলো। বেহালা নির্মাতা বুসোত্তির স্ত্রী আনা সন্তানপ্রসবের সময় মতারা গেলে বুসোত্তি তার প্রিয়তমা স্ত্রীর শরীরের রক্ত নিয়ে বার্ণিশ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্মান লাল বেহালাকে। সঙ্গীতের মূর্ছনায় নানা ঘটনার সমাবেশে এ এক অনবদ্য বর্ণচ্ছটা যা আমাদের করে গেল মুগ্ধ। গতানুগতিক কাহিনী - কেন্দ্রিক সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে সিনেমা তার নিজস্ব ভাষায় যখন কথা বলা শু করে তখন সেই সিনেমায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ডেনমার্কের পরিচালক লার্স ভনত্রিয়ের এমনই এক ছবি 'ডগভিল' তৈবী করেছেন। ছবির বাস্তবতার ইমেজ আর প্রকৃত বাস্তবতার সীমারেখা ভেঙে এ ছবি দর্শকের বোধ ও বিশ্লেষণের সংশ্লেষণ ঘটাবে। একটি দীর্ঘ প্রস্তাবনা আর নটা পরিচ্ছদে ছবিটি বিভক্ত। রকি পর্বতের কোলে গড়ে তোলা হয়েছে 'ডগভিল' নামে একটি শহরের ধারণাকে। থিয়েটারের মঞ্চের মতো তৈরী এ শহর। রাস্তা, বাড়ি - ঘর সব সাদা রঙের রেখায় বিভক্ত। এ শহরে সবাই কাজে ব্যস্ত। শুধু বেন নামের এক বোহেমিয়ান ট্রাক চালক তার ট্রাকটি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত। এই শান্ত - নিস্তরঙ্গ শহরে উপস্থিত হয় এক পলাতক যুবতী। এ শহরের ছেলে টম তাকে অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে অনিচ্ছুক শহরবাসীদের মন ভিজিয়ে শর্তাধীনে আশ্রয় দেয়। শর্ত ঠিক ঠিক পালন করে গ্রেস নামের মেয়েটি শহরবাসীদের হৃদয় জয় করে। টম আর গ্রেসের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার ঘটে। ইতিমধ্যে একদিন পুলিশ শহরে এসে পলাতক গ্রেসের ছবি টাঙিয়ে পুরস্কার ঘোষনা করে। শহরবাসীরা গ্রেসকে লুকিয়ে রাখে চাক নামে এক প্রৌঢ়ের আশ্রয়ে। সেই প্রৌঢ় চাক গ্রেসের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। বিমর্ষ গ্রেস এরপর শহর থেকে পালাবার জন্য ট্রাকচালক বেনের শরণাপন্ন হয়। যৌনক্ষুধায় আক্রান্ত বেন ট্রাকের মধ্যে গ্রেসকে ধর্ষণ করে মাঝ রাস্তা থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। টম তার প্রণয়িনীর এমন বিপর্যস্ত অবস্থা শুনে হতাশা থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে সমস্ত ধবংস করে দেয়। পরিচালক সূত্রধরের ভূমিকায় ধারাবিবরণীতে গল্পের খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে বিবৃত করেছেন। ক্যামেরার সাহায্যে নানা ইমেজের সৃষ্টি করেছেন। টম ও গ্রেসের পরিশীলিত প্রেমের মুহূর্তগুলি সুন্দর দৃশ্যমান হয়েছে পরিচালকের

মার্জিত মুন্সিয়ানায়। চাকের গ্রেসকে ধর্ষণের সময় নির্বিকার শহরকে তুলে ধরা, পালাবার শাস্তিতে গ্রেসের বরফঢাকার রাস্তা ভারি লোহার চাকা টেনে টেনে মসৃণ করা, সবার মৃত্যুর পর গ্রেসের চলে যাবার পর নির্জন শহরে কুকুরের তীব্র ডাক সবই ক্যামেরার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ছবি হয়ে উঠেছে মানবিক ইমেজে পরিপূর্ণ। কল্পনা, পরাবাস্তব, অ্যাবসার্ডিটির সংমিশ্রণ এ ছবি অসাধারণ দ্যুতিময়। এ ছবি মস্তিষ্কের, এ ছবি হৃদয়েরও। আফগানিস্তানের ছবি 'ওসামা' ছবিটার মধ্যে বিন লাদেনের গন্ধ পেয়ে ঢুকে দেখলাম নাহ এ ছবির ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। পরিচালক সিদ্দিক বারম্যাক নামটাই শুধু নিয়েছেন, গল্প অন্য। তালিবানজমানায় এক আফগান কিশোরীর মর্মন্তুদ কাহিনী এর উপজীব্য। এক বার বছরের কিশোরীর বাবা ও মামা মারা যায় তালিবানি অত্যাচারে। সীমাহীন দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে কাজের আশায় তার মা কিশোরীটির চুল কেটে কিশোরে পরিণত করে তাকে এক দোকানে কাজের জন্য পাঠায় পরে তালিবান গড়ার লক্ষ্যে। এই দলে তার পূর্বপরিচিত এসপন্দি নামে একটা ছেলে ছিল। সে তালিবানি প্রথায় অসুখ সারাতে ধোঁয়া ছিটিয়ে পয়সা রোজগার করতো। সে ওকে চিনে ফেললেও সবার সামনে সনাক্তকরণে তাকে ছেলে বলেই ঘোষণা করে নাম দেয় 'ওসামা'। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়ে কিশোরী রজস্বলা হয় এবং ধরা পড়ে যায়। তালিবানি আইনে তাকে মৃত্যুদণ্ডের বদলে এক বুড়ো মোল্লার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। যার আরও তিনটি স্ত্রী বর্তমান। নিদাণ অসহায় মেয়েটি ওই বৃদ্ধের শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধ্য হয়। আফগান বিধবাদের ভুখামিছিলের ওপর তালিবানি অত্যাচার, সাইকেলে মেয়েদের বসার বিদ্ধে ফতোয়াজারি, ছোট থেকেই ছেলেদের তালিবানি তৈরী করা, সাংবাদিকের উপর গুলি চালানো, মানুষের প্রাত্যহিক আচার অনুষ্ঠানে তালিবানিহস্তক্ষেপ, জেনানা ফটকের বন্ধ দরজায় নির্মম আওয়াজের পাশাপাশি অপাপবিদ্ধ কিশোরী ও ওসামার দড়ি লাফের প্রাণ স্পন্দন পরিচালকের সৃষ্টি চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সমগ্র আফগান সমাজের হাহাকার প্রতিফলিত। বৃদ্ধ মোল্লার ঘরে তালাবন্দি বিবিদের সঙ্গে ওসামারমতো কিশোরীদের অবিরাম সংযোজনের অমানবিক দলিল এ ছবি। পরিচালকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টাকে কুর্নীশ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার মতো দর্শকেরা বিষণ্নস্তব্ধ। এরকম ছবিই উৎসবকে করে মহিমান্বিত। রোমানিয়ান পরিচালক সিনিশ দ্রাকিনের সামাজিক দায়বদ্ধতার ছবি 'দ্য ফারাও'। ছবির নামের মধ্যে ইতিহাসের এক পৌষের প্রতীক চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। সেই প্রতীকী চরিত্রটিই ছবির কাহিনীতে প্রতিফলিত। এক টিভি সাংবাদিক এক নৃত্যশিল্পী একটা ছবি তৈরী করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন একটি শোককাহিনীর প্লট। খুঁজতে গিয়ে 'ফারাও' ছদ্মনামের একজন বিপ্লবীকে পেলেন। যাঁর আসল নাম হলো গুস্তাফ সিকোলাও। তিনি একজন আদর্শবান কমিউনিস্ট, কিন্তু অতি বামবিচ্যুতির শিকারে পরিণত হয়ে চল্লিশ বছর সাইবেরিয়ায় বন্দী ছিলেন। গ্লাসনস্তের যুগে তিনি যখন দেশে ফেরেন তখন স্মৃতিভ্রষ্ট এক অসংলগ্ন মানুষ। সাংবাদিক আন্দ্রিয়ানা সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁর কাছে বারবার নানাভাবে প্রশ্ন করে শুধুমাত্র একটি উত্তরই পাচ্ছেন --- ''ওরা এসেছিল রাত্রে''। আন্দ্রিয়ানা তাঁর বোনের কাছে, তাঁর অভিনেত্রী প্রেমিকার কাছে গিয়েও তাঁর অতীত ইতিহাসের সন্ধান পেলেন না। মিশরের ফারাওদের রহস্যময় জীবনের মতো এই ফারাও তথা গুস্তাফ সিকোলাওয়ের জীবন রহস্যের অন্ধকারেই আবৃত রইলো। এ ছবি বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে এক ভিন্নতর ছবি। কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্রের সুষ্ঠু মিশ্রণের ছবি। কমিউনিজম থেকে গ্লাসননস্তের তথা ধনতন্ত্রের সন্ধিক্ষণে রোমানিয়ন সমাজের বাস্তব চিত্র পাই। বর্তমান রোমানিয়ন সমাজের সঙ্গে অতীত সমাজের আর্থ - সামাজিক অবস্থানকে দেখানো প্রচেষ্টায় নির্মিত এ ছবি। কমিউনিজমকে হেয় করার প্রচেষ্টা নয়, বরং দেখি, অনেক চেষ্টায় ফারাওয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত দুটি কথা --- 'Long live Stalin, Long live Communist Party' পরিচালকেরই প্রত্যয়ের প্রকাশ। সত্যান্বেষণের আর্তিতে ভরা এ ছবি। ছবির প্রথমে এবং শেষেও পরিচালক মমির দেশের 'ফারাও' -এর মুখের ইমেজ সাধারণ মানুষের মুখে বসিয়েছেন। মমির দেশে ঘুমিয়ে থাকা রহস্যাবৃত ফারাও - এর ভাবমূর্তি এ যুগের ফারাও - এ আঁকা হয়েছে শৈল্পিক চেতনায়। এ যুগের ফারাও তথা গুস্তাফাও একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু বিগত যুগের মতো তিনিও রয়ে গেলেন ইতিহাসের আধারে। প্রতিশ্রুতিবান এ পরিচালক আমাদের সিনেমার নতুন ব্যাকরণ জানিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। ব্রাজিলের ছবি ''দ্য মিডল অফ দ্য রোড'' ছবিটা দেখে কয়েক বছর আগে সোলানোসের ''দ্য জার্ণি'' ছবিটার কথা মনে আসে। নিশ্চিন্ত হলাম হলিউডি আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে ব্রাজিল আবার স্বকীয়তায় ফিরে গেছে। পরিচালক ভিনসেন্ট আমোরিমে ঝিায়নের প্রভাবে সে দেশের আর্থ - সামাজিক এবং মিশ্র সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। চাকুরীচ্যুত ট্রাক চালক রোমাও ভাল চাকরীর সন্ধানে পুরো পরিবার নিয়ে সাইকেলে পাড়ি জমায় রাজধানী রিও - ডি - জেনিরোর

উদ্দেশে। এই পথপরিক্রমায় তারা পাঁচটা রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ছয়মাস ধরে। পথিমধ্যে নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। ক্ষুধা, বৈরিতা, বড় ছেলের বিদ্রোহ যেমন ছিল, তেমনি আবার বিভিন্ন লে াকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রভৃতি নানা ঘটনা ওদের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করে। যে দেশকে তারা জানতো তার পরিবর্তন সচক্ষে দেখে বিষণ্ণতায় মেদুর হলো। বড় ছেলে বিদ্রোহী হয়ে পরিবার থেকে ছিটকে গেলে মায়ের সখেদ মন্তব্য - -- 'এভাবেই বোধহয় আমরা একে অপরের থেকে হারিয়ে যাবো।" এই পরিক্রমার কাহিনীকে উপজীব্য করে পরিচালক মুন্সিয়ানার সঙ্গে সমগ্র ব্রাজিল দেশটার চালচিত্র তুলে ধরেছেন। কাহিনীর (সত্য ঘটনা) অভিনবত্ব দিয়ে এই ছবিটিতে ঝিায়নের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পরিচালক ছবিতে রাজনীতির অবতারণা না করেও রাজনৈতিক আবর্তে পরিক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। আধুনিক শিকড়হীন পরিবারও মানুষের যন্ত্রণাকে এভাবে চিত্রায়িত করার জন্য পরিচালকের সংবেদনশীল মননের সঙ্গে আমরাও একীভূত হলাম। আন্তর্জাতিক সিনেমা মহলে ছোট্ট দেশ আইসল্যাণ্ড এখনও সেভাবে পরিচিত হয়নি। পরিচালিকা সলভিগ অ্যাসপেকের বা তার দেশের ছবি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁর "স্টর্মি ওয়েদার" ছবিটি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির চলচিচত্র। এ ছবির প্রাণকেন্দ্রে এক বিষাদগ্রস্ত চেতনার ছায়া বিরাজমান। মানসিক ভারস াম্যহীন এক চরিত্রের বিচারণ আর অন্য এক চরিত্রের অন্বেষণে চলচিচত্রের বিস্তার। ছবিতে কারিগরি কলাকৌশল বা স্পেশাল এফেক্ট ব্যবহার না করে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিনি ছবির বিষয় বস্তুর স্বার্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ছবির বিষয় মানুষের আন্তঃসম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এ ছবি প্রশ্নের জন্ম দেয়, ভাবনার অবকাশ রাখে। মূলতঃ নারীভাবনায় ভ াবিত পরিচালিকার ছবি আমাদের মেদুরতায় আচ্ছন্ন করে। জাতিগত দাঙ্গা - পরবর্তী সমাজ - বাস্তবতার ছবি বোসনিয় ার 'ফিউজ'। পরিচালক জালিকা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের দেশের জাতিগত লড়াইয়ের জের হিসেবে অসহিষ্ণুতা, খুন, বেশ্যাবৃত্তি, ভ্রষ্টাচারের নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন। দাঙ্গা বিধবস্ত বোসনিয়ায় হঠাৎ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আসার খবরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্টের আসার খবরে সবাই আশান্বিত হয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে। সাতদিনের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সপ্রাণ প্রচেষ্টার এ ছবি ট্র্যাজিক - কমেডির আঙ্গিকে নির্মিত বাস্তবতার দলিল। পরিচালিকা ক্যাথরিন া ব্রেলেটের "সেক্স ইজ কমেডি" আত্মবিশ্লেষণীধারার চলচিচত্র। ছবির কেন্দ্রীয় সমস্যা ছবিতে যৌন দৃশ্যের অভিনয় নিয়ে। যৌন মনস্তত্ত্বের ছবিও বলা যায়। পরিচালিকার কথায়, তাঁর আগের ছবি "ফ্যাট গার্ল" করতে গিয়ে দেখেছিলেন নগ্নদৃশ্য অভিনয় করার সময় অভিনেত্রী - অভিনেতা কী ভীষণভাবে অস্বস্তির শিকার হয়ে পড়েছিল। যারা সাবলীল অভিনয় প্রত্রিয়া ভুলে বোকার মতো আচরণ করছিল। এই সমস্যাটাই পরিচালককে ভাবিয়ে তুলে পরবর্তী সিনেমার জন্ম দেয় --- 'সেক্স ইজ কমেডি'। এ ছবি অন্য ধারার, নতুন শতকের। ছবির মধ্যে ছবি ও তার মধ্যে ছবি। যেমন প্লট নির্মাণ, তেমনি বিষয় ও ব াস্তবতা। নামে কমেডি, কিন্তু আসলে সিরিও - কমিক। ছবিতে নায়ক - নায়িকা নগ্নদৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে এতটাই ম ানসিক ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে চুম্বন দৃশ্যেরও সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে। ফলে পরিচালিকার নির্দেশে কৃত্রিম পুষাঙ্গ ব্যবহ ার করতে হয় নায়ককে। সিনেমার এ সমস্যাকে বাস্তব রূপে তুলে ধরে একটা চমৎকার নাট্যকর্মের সৃষ্টি এ চলচিচত্রকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়। গতি, ছন্দ, উইটের সংমিশ্রণে ফরাসী ছবির ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েও ক্যামেরাকে কলমে পরিণত করে এ ছবি স্বতন্ত্র ধারার। প্রতিভাময়ী এই পরিচালিকা চলচিচত্র শিল্পে মহার্ঘ সংযোজন। হাঙ্গেরীর ছবি 'কনট্রোল' মেট্রোরেলকে কেন্দ্র করে জীবনের তাড়নায় অস্থির নায়কের অস্থিরতার ছবি। উজ্জ্বল মেধাবী কুড়ি বছরের তণ কেরীয়ারের তোয়াক্কা না করে মেট্রোরেলের টিকিট চেকারের চাকরী নেয়। টিকিট - বিহীন যাত্রী, ভবঘুরে, দুষ্কৃতিদের পিছনে তাড়া করে বেড়ায়। কর্তব্যকর্মে সত্রিয় এরা বাহিরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা তো পায় না উপরন্তু ঘৃণা জোটে। এ ছবির নায়ক মেট্রে াকেই তার আস্তানা বানিয়ে নেয়। গতানুগতিক বাসগৃহের পরিবর্তে মেট্রোষ্টেশনই তার অবাসস্থল। খুঁজে বেড়ায় মেট্রে ারেলের আত্মহত্যার ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্রকারী এক কালো পোশাকের মানুষকে। মেট্রোর সুড়ঙ্গের মধ্যে আর এক সুড়ঙ্গ গহ্বর তাকে তাড়া করে বেড়ায় স্বপ্নে। ক্যারোর অনুসরণে নায়কের সুড়ঙ্গের মধ্যে অস্থির মানসিকতায় ছুটে বেড়ানোর দৃশ্য বা তার স্বপ্নদৃশ্য এ ছবির অনন্য সম্পদ। জার্মান পরিচালক ফেইয় আকিনের ছবি 'হেড অন' কাহিত নামে এক মধ্যবয়স্ক ব্যর্থ রক সঙ্গীতকারের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মদ্যপ হয়ে উঠে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে আবার জীবনে ফেরার কাহিনী। অ াত্মহত্যায় ব্যর্থ কাহিতের সঙ্গে আর এক আত্মহত্যার ব্যর্থ তণী সিবিলের দেখা হয়। তুর্কি এই তণীর জন্ম এক গোঁড়া মুসলিম পরিবারে। কিন্তু বন্ধনহারা এই তণী ওই পরিবেশ থেকে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য কাহিতকে

বিয়ে করতে চায়। কারণ পরে সে ইচ্ছেমতো বিবাহবন্ধনকে ছিন্ন করে উদ্দাম জীবনযাত্রায় মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কাহিত সিবিলের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। একদিন পানশালায় কাহিত সিবিলকে অন্য পুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে উন্মত্ত হয়ে ত ার সঙ্গীকে উচিত শিক্ষা দিতে গিয়ে অসাবধানগতভাবে খুন করে ফেলে এবং গ্রেপ্তার হয়। কাহিত জেলে অন্তরীণ থাকার সময়ে সিবিল একজনকে নিয়ে থাকে এবং তার সন্তান হয়। পরবর্তীকালে কাহিত ছাড়া পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিবিলের সাক্ষাৎ পায়। সিবিলের পুরাতন প্রেম জেগে উঠলেও তার আর ফেরার উপায় ছিল না। ছবিটার মূল সুর জীবনে যন্ত্রণা পাওয়াটাই যেন জীবনের অঙ্গ। স্যাডিষ্ট চেতনার ছবি। কটিন মজাদার আর বীভৎস রসে পূর্ণ এ ছবি মেলে াড্রামাটিক রসে জারিত। তবে মনোগ্রাহী উত্তেজক দৃশ্যের অবতারণার দক্ষতায় দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য। ভেনেজুয়েল ার ছবি 'লভ ইন কংক্রিট' সেখানকার সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব। পরিচালক ফ্র্যাংকো দ্য পেনা রাজধানী কারাকাসের এক রা ত্রির এক বিশৃংখল জীবনকে তুলে এনেছেন। এই বিশৃংখল জীবনযাত্রায় বিতৃষ্ণ কয়েকজনের অন্বেষন অকৃত্রিম ভালবাসার উষ্ণতা পেতে। প্রযোজকের অভাবে এ ছবি মাত্র আশি হাজার ডলারে তেইশদিনে তৈরী। কিন্তু ছবিতে দারিদ্র্য বা মার্জিত দক্ষতার কোনো অভাবই চোখে পড়লো না। 'অই ফাক দি জাজমেন্ট'' ছবি থাইল্যাণ্ডের পরিচালক পানযাম থংসাং এক বিকারগ্রস্ত তণী সৎমাকে নিয়ে বিব্রত এক ধর্মভী সন্তানের টানাপোড়েনের কাহিনী। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে। সামা জিক বিদ্ধতা এবং সমবয়স্ক সৎমায়ের বিকারগ্রস্ত প্রলোভনকে জয় করে ছেলে পাকের অদম্য লড়াইকে কেন্দ্র করে পরিচ ালক বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে আগ্রহী ছবি বানিয়েছেন। রাশিয়ার ছবি 'দ্য রিটার্ন' দুটি ভিন্ন ঘটনার সমাবেশে প্রত্যাবর্তনের মর্মন্তুদ কাহিনী। বহু বছর বাদে বাবা ফিরে আসার পর দুই ছেলের মানসিক সঙ্কট নিয়ে পরিচালকের এ ছবি সংবেদনশীল মননের কাব্যগাথা। দশ বছরের পুরাতন বাবার ছবি দেখে তারা উপস্থিত বাবাকে নিয়ে সন্দিহান। কেন তার এত বছর ব াদে আগমন তাতাদের ভাবিয়ে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে বাবার নির্লিপ্ত মনোভাব বড় ছেলের চেয়ে ছোট ছেলে মেনে নিতে পারে না। বাবা এক রহস্য অভিযানে ছেলেদের সঙ্গী করে। যাত্রাপথে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাদের পড়তে হয়। একসময়ে ছোট ছেলে কষ্টকর অভিযানে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে রাগে, অভিমানে পুরাতন একটা লাইট হাউসের উপর উঠে ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যা করতে চায়। বাবার সেই সময়েরআকুলতা এবং তাকে নামিয়ে আনতে গিয়ে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ছেলেদের কাছে 'বাবা' ডাকের স্বীকৃতি লাভে এ ছবির পরিসমাপ্তি।প্রত্যেকের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির অনন্য সম্পদ। কামেরায় গতির হেরফের ঘটিয়ে এ ছবি বিষণ্ণতার বা/য়রূপ। জার্মাণির ওলফ্যাং বেকারের 'গুডবাই লেনিন' এবারের উৎসবের নতুনদের মধ্যে অন্যতম সেরা ছবি। ১৯৮৯ সালে কমিউনিস্ট শাসিত পূর্বজার্মানির সঙ্গে পুঁজিবাদী পশ্চিমজার্মা নির একত্র হওয়ায় পটভূমিকায় এ ছবি তৈরী। কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় লালিত এক মহিলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে মিলনকে সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কোমায় চলে যায়। আটমাস পরে সে কোমা থেকে যখন জীবনে প্রবেশ করে তখন দুই জার্মানির মিলন সম্পূর্ণ। ডাক্তারের নির্দেশে কোনোরকম মানসিক আঘাত থেকে তাকে বাঁচাতে মিলনের সংবাদ গোপন রাখে ছেলে অ্যালত্রে। মাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বোঝানো হলো সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। ছেলের নানাভাবে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মাকে সুস্থ রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো কমেডির উপাখ্যান পেতে পারেন, কিন্তু হৃদয় - বিদারক এ ছবির মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্য সংবেদনশীল মননের প্রয়োজন মহিলার মানসিক দ্বন্দ্বের বিস্তৃত ছবি পরিচালক নিরাসক্ত ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের সন্ধিপর্বের এ নির্মম ঘটনা অপূর্ব শিল্প - সুষমায় তুলে ধরে আমাদের হৃদয়কে করেছেন বেদনায় আপ্লুত। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয়ান ছবির স্ব ীকৃতি পাওয়ায় কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কলম্বিয়ার পরিচালক তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য ওয়াণ্ডারিং শ্যাডোজ' - এ সিনেমার ভাষায় যেভাবে পাপ ও বেদনাকে গ্রথিত করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ছিন্নমূল দুই প্রতিবন্ধীমানুষের অস্তিত্বের মরমী কাহিনী সাঙ্কেতিক ভাষায় চিত্রিত। একজনের দুটো চোখে ঠুলি লাগানো -- সেই অবস্থায় পিঠে চেয়ার বেঁধে শহরের পথে পথে পরিত্রমা করে মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় পয়সার বিনিময়ে। আর একজনের একটি প া কৃত্রিম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করে। উপার্জনহীন অক্ষম । পাওনাদারদের উৎপীড়ন, পাড়ার মস্তানদের দ্বারা নিগৃহীত -- এসব তার নিত্যদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গ। কালত্রমে এই দুজন একে অপরের নিকটজন হয় এবং পরে আবার বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। সম্পর্ক স্থায়ী নয়, জীবনও স্থায়ী নয় --- এটাই দ্বান্দ্বিক নিয়মের সূত্র। প্রতীকের ব্যবহারে পরিচালক দেখান দুই মানুষের অতীত জীবন। খোঁড়া মানুষটিকে একসময় দেখা যায় বৃষ্টিতে ভিজতে, আবার পরমূহূর্তেই বৃষ্টির ফোঁ

াটার মতো বুলেটে তাকে দেখি ছিন্ন-হস্ত রক্তাক্ত হতে। প্রতীকের আবরণ ভেদ করে আমরা বুঝতে পারি যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বলি এই মানুষটির জীবন। প্রতীকের আবরণ ভেদ করে আমরা বুঝতে পারি যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বলি এই মানুষটির জীবন। অন্ধমানুষটির অতীত আবার যুদ্ধ, হত্যা আর সন্ত্রাস সৃষ্টির নায়করূপ। এখন বিবেকের তাড়নায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মানুষকে বয়ে বেড়াচ্ছে নামমাত্র পয়সার বিনিময়ে। সে কেন হত্যা ও সন্ত্রাসের নায়ক তা জানে না। সে বলে --- ‘I killed, But I donn’t ক্সন্সভ্র ভ্রড়ম্ভ’. এ ছবি গদারের ছবিকে মনে করায় প্রতীকি ভাষার কারণে। পরিচালক নিজস্ব সিনেমার ভাষায় এ ছবি করে স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। এ ছবি দেশ - কালের উর্ধ্বে উঠে সমস্ত নির্যাতিত, অসহায় মানুষের আলেখ্যরূপে চিহিত হবে। তীক্ষ্ন সংলাপে, মন্তাজের চমৎকার ব্যবহারে, পরিমিতির দক্ষতায়, ক্যামেরার প্রজ্ঞায় কাহিনীকে অসামান্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ ছবি উৎসবের অলঙ্কার। উৎসবের শেষ ছবি ছিল কার্লোস সাউরার ‘‘দ্য সেভেনথ ডে’’। সাউরার ছবি মানেই অধিবাস্তববাদ বা অতীন্দ্রয়বাদের যাদুমিশ্রণ। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে জমির সীমান নিয়ে রক্তাক্ত সংঘর্ষের মতো অতি সাধারণ বা বহুঘতি একটি বষয়বস্তুর ছবিকে ম্যাজিক রূপান্তর ঘটিয়ে অসাধারণ কাব্যময়তায় রূপ দেওয়া সাউরার পক্ষেই সম্ভব। করাল বাস্তবকে সুররিয়ালিজমের ছন্দে গ্রথিত করে মহাকাব্যিক পর্যায়ে তুলে এনে বারবার আমাদের মুগ্ধ করে চলেছেন। যেমন সিনেমার ভাষা তেমনই ক্যামেরার কাব্যিক চিত্রকল্পে সিনেমায় কবিতার জন্মদিয়ে সাইরা আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন একের পর এক ছবি।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে আমাদের সেরা পাওনা কিছু ধ্রুপদী ছবির প্রদর্শণী। পেলাম পিটার গ্রিনওয়ে, ইস্তবান জাঁবো, আইজেনষ্টাইন, কুরসোয়া, ডি সিকা, চ্যাপলিন, বুনুয়েল, রেঁনোয়া, বার্গম্যান, গদারদের, যাঁদের সঞ্চরণ পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে, স্বপ্নেরউত্তরণে। এদের সিনেমাপ্রদত্ত স্বপ্নের আসঙ্গ লিপ্সায় আমরা এখনও হই উদ্বেল। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এঁরা যে নতুন নতুন পরীক্ষা - নিরীক্ষার মধ্যে।

ব্রিটিশ পরিচালক পিটার গ্রীণওয়ের জন্ম দ্বিতীয় ব্বিযুদ্ধের অন্ধকার সময়ে। তাঁর অবচেতন মনে সেই সব স্মৃতি ঘিরে থাকার জন্য তাঁর ছবিতে জীবন, মৃত্যু, মানুষর সমাজ এবং সমাজনিরপেক্ষ সম্পর্কগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ প্রতীয়মান দার্শনিকতার মোড়কে। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে তিনিই একমতাত্র দার্শনিকতার উপস্থাপনা নিয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ পরিচালক। সিনেমার ভাষায় রূপক প্রতীকের সমন্বয়ে রঙের বিচিত্র খেলায় কবিতায় উত্তরণে তিনি পাসোলিনির উত্তরসুরি। গ্রীণওয়ে সিনেমার আঙ্গিকে চিত্রশিল্পের মূর্ততা ও বিমূর্ততা নিয়ে প্রথাগতশৈলী থেকে ব্যত্তিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াসী। ব্বিবীক্ষা তঁার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেছেন ----‘‘The work of art that I admire…have that ability to put all the world together’’ সংপৃক্তির এই গভীর বোধ থেকেই তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ। ‘দ্য পিলো বুক’ গ্রীণওয়ের নিজস্ব চেতনায় তৈরী জাপানী কামদ প্রেমের উপাখ্যান। চৈতন্যের মগ্নতা নিয়ে তৈরী ‘প্রস্পেরো’স বুক’। স্পেশাল এফেক্টসের অভাবনীয় প্রয়োগ দুরন্ত এই ছবি বহুকাল মনে থাকবে। ‘দ্য কুক, দ্য থিফ, হিজ ওয়াইফ অ্যাণ্ড হার লাভার’’ একটি নির্মম সমাজচিত্রের ছবি। যৌনতা, হিংস্রতা, রক্তপাত, প্রতিশোধের এক সম্ভব-অসম্ভবের মিলিত প্রয়াসে সুররিয়ালিজম চলচ্চিত্র। এ ছবি বেলিনির ‘সাতেরকিন’ এবং পাসোলিনির ‘ক্যান্টারবেরি টেলস’ এর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এক বর্বর দুর্বৃত্ত ও তার ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর কাহিনী উপস্থাপনা করেছেন স্যাটায়ার ভঙ্গীতে। এক চোর তার সঙ্গীদের নিয়ে রেস্তরাঁতে আড্ডা গেড়ে উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করে দিনের পর দিন। তার গালিগালাজ চলতে থাকে সাঙ্গোপাঙ্গ এবং স্ত্রী জর্জিনার উদ্দেশে। শান্ত স্ত্রী ওই রেস্তরাঁতে আসা এক গ্রন্থকীট পুষের প্রেমে পড়ে যায়। দৈহিক মিলনেও তারা আবদ্ধ হয়। স্বামীর দিনের পরদিন অসহ্য অপমানের প্রতিশোধ নেয় এভাবে। কিন্তু একদিন সেই প্রেমিক ধরা পড়ে। চোরেরা তাকে প্রাচীন রোমের অনুশাসন মতো কেটে ফেলে। জর্জিনা তার প্রেমিকের এরকম নৃসংশ হত্যায় প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠে। সে পরিকল্পনা করে এই মৃত প্রেমিকের মাংস রান্না করে স্বামীকে খাওয়াবে। এ এক বীভৎস প্রতিশোধের চিত্রনাট্য। ভয়ঙ্কর এবং চমকপ্রদ চলচ্চিত্র ভাষা। ভিন্ন স্বাদের উদ্ভাবনীশৈলী। চোরেদের পোশাক, নানারঙের আলোয় মুন্সিয়ানায় এক আশর্চ্য বাতাবরণে এ ছবি স্পটিক্ দর্পণে ঋদ্ধ। টেকনোলজির কৌশলী প্রয়োগে গ্রীণওয়ে যান্ত্রিক বাস্তবতারও চলচ্চিত্র চিত্রশিল্পী।

হাঙ্গেরীর ইস্তবান জাঁবো নিরাপত্তার অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু এক চলচ্চিত্রকার। প্রতিটি ছবিতে নিজেকে ভেঙেছেন। ভাঙতে তিনি চলমান জীবনের নিরাপত্তা খুঁজেছেন। লিরিকের মূর্ছনায় সময় ও পরিবেশকে অতিক্রম করে গেছেন তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকাণ্ডে। বলেছেন ---‘‘আমি ছবি করি সেই ভাবনা নিয়ে যা মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরী করে, যাতে দর্শক সেই ভাবনার

সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে, যাতে মানুষের বোঝার জগৎ এবং অনুভূতির ক্যানভাস আরো প্রসারিত হয়, আমার অনুভূতির ও জ্ঞানের জগৎ যাতে প্রসারিত হয়।" নিজের অভিজ্ঞতাকে শৈল্পিক ভাবনায় রূপান্তরিত করার অনলস প্রচেষ্টা তাঁর নির্মাণে। সংবেদনশীল মননে পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে করেছেন আত্মস্থ। তার প্রতিফলন পেয়েছি --- 'ফাদার', 'কর্ণেল রেডিল', 'সুইট ইস্মা, ডিয়ার বর', 'হানুসিন', 'টেকিং সাইড', 'দ্য এজ অব ডে ড্রিমিং', 'বুদাপেস্ট টেলস', 'কনফিডেন্স', 'মেফিস্টো'র মতো ছবি। 'বুদাপেস্ট টেলস' একটি স্বপ্নময় অভিযাত্রার সিরিওকমিক। মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে এই অভিযান জাঁবোর চলচিচত্রের মূলসুর। মানুষের চলমান জীবনের সুখ - দুঃখ, সাহস, ঈর্ষা, ত্রোধ, প্রতিকূলতা অতিত্রম করার যে ইতিহাস তা অন্তহীন প্রবাহের মতো চলতে থাকে। তিনি গল্পহীন গল্পের দ্বারা অনন্য চিত্রনাট্য ক্যামেরার সুচা প্রয়োগে আমাদের ভাবনায় মানবিক উন্মেষ ঘটিয়েছেন। 'কনফিডেন্স' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকের পটভূমিকায় বিশ্বাস অ ার ভালোবাসার দ্বন্দ্ব নিয়ে তৈরী। জাঁবোর 'মেফিস্টো' বিশ্বের চলচিচত্র তালিকায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। নাটক থেকে তৈরী এক চিত্রনাট্য। হফজেন নামে এক বিখ্যাত অভিনেতা অভিনয় জীবন শু করে বামপন্থী রাজনীতির পথ ধরে। পরবর্তীকালে নাজী শাসনকালে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকদলের কাছাকাছি থাকতে আরম্ভ করে। নাজী নেতাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির পিছনে ছুটতে থাকে। অন্য অভিনেতারা যেখানে নাজী জমানায় নিজেদের মানিয়ে নিতে না পেরে দেশ ছেড়ে পা লিয়ে যায় সেখানে হফজেন রারেগ্তার করে তাদের ইচেছমতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তার উপলব্ধি হয় তাদের ইচেছমতো কাজ করতে গিয়ে তার স্বাধীন অভিনয়ের স্ফুরণ ঘটছে না। নিজস্ব সত্তার অপমৃত্যু ঘটছে। ত্রমে হতাশায় দীর্ণ হয়ে একাকী হয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত প্রযোজনার ছবি। হ্যামলেটের ভাষ্য বদলানোর জন্য যখন হফজেনকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপর সার্চ লাইট ফেলা হচ্ছে তখন হফজেনের মানসিক অস্থিরতার দৃশ্য এককথায় অসামান্য। অভিনয়, রঙ ও গতির মূর্ছনা ছবির সম্পদ। আবহসঙ্গীতকে ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। রাজনৈতিকনিষ্পেষণে বিপন্ন হয় শিল্প ও শিল্পীর স্ব াধীনতা ---এ ছবি তারই পরিচয় বহন করে। 'হানুসিন' ছবির নায়ক এক অষ্ট্রিয়ান সৈনিক। সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাথায় আঘাত লাগার পর থেকে বিচিত্রভাবে হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। মানুষের পরিণতি সে আগাম জানিয়ে দেয়। এভাবেই সে জানিয়ে দিয়েছিল নাজী জমানার অভ্যুত্থানের কথা। নাজিদের নানা কুকর্মের কথা সে আগেভাবেই জানিয়ে দিয়ে নিজের আসন্ন বিপদের বার্তাও উপলব্ধি করে এবং অবশেষে তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে। হিটলারের নাজি জমানার দমবন্ধ ভয়ঙ্কর সঙ্কটময় পরিস্থিতির ছবি। তাঁর ছবি এরকম অস্তিত্বের সঙ্কটে অস্থির। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়ে দ্বা ন্দ্বিকতার সূত্র ধরে তাঁর ছবি আমাদের সিদ্ধান্তের সম্মুখীন করে। তাঁর বিনির্মাণ প্রত্রিয়ায় মানুষ, গাছ, গাড়ি সব ব্যঙ্গময় রূপ ধারণ করে কবিতার মূর্ছনায় আমাদের আবিষ্ট করে।

আইজেনষ্টাইনের 'ব্যাটলশিপ অব্ পোটেমকিন' নিয়ে বেশী কথা বলার নেই। কারণ এ ছবির প্রদর্শনের পরেই সিনেমার ম াইলষ্টোন রূপে পরিগণিত হয়েছে। বুর্জোয়া চলচিচত্রের অচলায়তন ভেঙে নস্যাৎ করে মানুষের সংগ্রাম সাফল্যকে তুলে ধরেছেন তাঁর এই বিশ্ব বিখ্যাত ছবিতে। মন্তাজের দ্বারা দ্বান্দ্বিক বিরোধ সংগঠিত করে নতুন ভাবনার সিনেমার জন্ম দিয়েছেন। বুনুয়েলের ছবি প্রথাগত মূল্যবোধ, ধর্ম ও সমাজকে ভেঙে মুক্তি ও স্বাধীনতার ছবি। তাঁর প্রতিবাদের ভাষা পর াবাস্তবের দিগন্তে সোচ্চার। নিস্পৃহ ক্যামেরায় চিত্রায়িত করেন দারিদ্র্য, নীতিহীনতা, নিষ্ঠুরতা। আচার -- অনাচার, ধর্ম, প াদ্রী -- যাজক সবাইকে শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন ছবিতে। ভয়াল ছবির মধ্যে স্বপ্নের নিঃশব্দ প্রবেশ ছবিকে দেয় সুররিয়ালিজনের আচছন্নতা।

নবতরঙ্গ চলচিত্র আন্দোলনের প্রকৃতস্রষ্টা গোদারের 'ব্রেথলেস' আজও মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে আকর্ষণ করে, শৈল্পিক ও আ ঙ্গিকে নতুনত্ব নিয়ে তাঁর প্রবেশ চলচিচত্রের আঙিনায়। 'Establishing Shot' এর পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন 'গ্লত্ত্বগ্গস্প স্তত্ত্বদ্ধ'। ডি সিকার "বাই সাইকেল থীভস" বিশ্বের চলচিচত্রে এক ধ্রুপদী ছবি। বাস্তবের গভীর পর্যবেক্ষণে নিজের উপলব্ধি মিশিয়ে তৈরী এ ছবি। সমাজের গভীর সত্যকে শৈল্পিক সুষমায় জারিত করে তিনি ছবি করেন। যুদ্ধোত্তর ইতালীর অর্থ - স ামাজিক পরিস্থিতির শিকার এক শ্রমিকের জীবনালেখ্য, যার মানবিক আবেদন আজও স্পষ্টঃ বিদ্যমান।

এবারের চলচিচত্র উৎসবের উল্লেখযোগ্য অবদান ইতালির বিখ্যাত নাট্য ও চলচিচত্র অভিনেতা তথা পরিচালক ভিত্তো রিও গাসমানকে পাওয়া। একশোর উপর চলচিচত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। বহুমাত্রিক এই অভিনেতা অভিনয়ের ব্যাপ ারে ছিলেন খুব নিখুঁত। সস্তা কমেডি থেকে ইনটেলেকচুয়াল অভিনয়ে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। এই অভিনেতার ছটা

ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল উৎসবের ‘হোমেজ’ বিভাগ।
এবারের চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে তথাকথিত ঝিায়নের কুফলে যে আর্থ - সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কিছু চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। তবে ওখানে হলিউডি বাণিজ্যিক ছবির দাপটে সমান্তর াল সিনেমা সংকটাপন্ন --- সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানালে কলম্বিয়ার পরিচালক সিয়ারো গোয়েন্দা। যে কোন সংস্কৃতিই হচ্ছে এক নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি। নোয়াম চামস্কির কথা --- “তথ্যকে দিনের আলোর মতো প্রকাশ করতে হবে।” স্বল্প হলেও এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে সেই সব ছবি আমাদের প্রেরণা দিয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com